ISSN 2072-3334
Development Compilation
Volume 11. Number 01. March 2015

শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ভূমিকা

ড. মো. খালেদউজ্জামান*

Abstract: Teaching is a Nobel profession. Education is the backbone of nation at the same time key principle also. In national progress and socio-economic development we need trained teacher who can enhance a person as human resource for development of Bangladesh. It is universal in the modern world the development of a country depends on the social-economical, educational and cultural development which development goes onto the human resource development. So, to build an educated, self-esteem and self dependent nation it's urgently need the development the professional skills for the teachers. In this regard, Teachers' Training Colleges (TTC) is plying a vital role to develop the professional skills of secondary level teachers' in our country.

ভূমিকা

জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ বেছে নেয় পেশা। পেশাগত দায়িত্ব পালন মানুষকে করে কর্মমুখী, দক্ষ ও অভিজ্ঞ। দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে নুতন পদ্ধতি ও কৌশল। পেশাগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পেশাগত প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের ফলে বাড়ে কর্মদক্ষতা। কর্মদক্ষতার মূলে রয়েছে তার কাজের প্রতি অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি ও উন্নত মনোবল।

শিক্ষকতা একটি মহান পেশা হিসেবে সকল সমাজে সমাদৃত হয়ে আসছে। যুগে যুগে সামাজিক প্রগতিতে ও উন্নত দেশগঠনে শিক্ষকগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। কেউ যদি ডাক্তার হতে চায় তাহলে এম.বি.বি.এস ডিগ্রী অর্জন করার পর বড় বড় ডাক্তারের অধীনে কাজ করে এফ.সি.পি.এস ডিগ্রী অর্জন করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিতে হয়। আবার ভাল এ্যাডভোকেট (উকিল) হতে চাইলে নামকরা এ্যাডভোকেটের অধীনে কাজ করতে হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগপ্রাপ্ত হন, তাদের অধিকাংশই ট্রেনিং প্রাপ্ত নয় বা তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির কোন প্রশিক্ষণ নেই। দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন জনসংখ্যার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তবে জনসংখ্যার গুণগত দিকটি সংখ্যাগত দিকের চেয়ে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। কোন দেশের জনসংখ্যা শিক্ষিত, কর্মদক্ষ, পরিশ্রমী, সৃজনশীল, উৎপাদনশীল এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে যখন সামগ্রিক উন্নয়নের চালিকা শক্তিতে পরিণত হয়, তখন সেই জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হয়। মানুষের প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়নই মানবসম্পদ উন্নয়ন।[১] প্রয়োগবাদী দার্শনিক এবং শিক্ষাবিদ জন ডিউই এর মতে, "শিক্ষার দুটি প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে, একটি হলো মানুষের স্বাভাবিক বিকাশে সহায়তা করা; অপরটি হলো মানুষের দক্ষতা অর্জন।" স্বাভাবিক বিকাশ

* সহযোগী অধ্যাপক, আইইআর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বলতে শরীর বর্ধন, দেহের গঠন, স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তির বিকাশ বুঝায় আর দক্ষতা বলতে, কর্মদক্ষতা ও সুনাগরিকের গুণাবলী বুঝায়।[২] এক্ষেত্রে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন অপরিহার্য।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৭২ সালে ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে গঠিত হয় "জাতীয় শিক্ষা কমিশন"।[৩] এই কমিশন ১৯৭৪ সালে "জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট" সরকারের কাছে পেশ করেন। এতে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের সুপারিশ করা হয়েছে। এরপর আরও অনেক শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে।

১৯৭৯ সালের কাজী জাফর আহম্মদের নেতৃত্বে গঠিত 'অন্তবর্তীকালীন শিক্ষানীতি', ১৯৮৩ সালের 'মজিদ খান শিক্ষা কমিশন', ১৯৮৮ সালে মফিজউদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন', ১৯৯৭ সালের 'শামসুল হক শিক্ষা কমিশন', ২০০০ সালের 'জাতীয় শিক্ষা নীতি', ২০০৪ সালের 'মনিরুজ্জামান মিয়া জাতীয় শিক্ষা কমিশন' এবং ২০১০ সালের 'জাতীয় শিক্ষা নীতি'।[৪]

প্রতিটি শিক্ষা কমিশনে শিক্ষকদের পেশাকে আকর্ষণীয় ও পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষকদের শিক্ষক প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে তিন ধরনের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে।[৫] প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষকদের জন্য রয়েছে নায়েম। নিম্নে শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ভূমিকা আলোচনা করা হলো।

টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সংখ্যা ও কাঠমো[৬]

বাংলাদেশে মোট ১১৮টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় রয়েছে। তার মধ্যে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ হচ্ছে ১৪টি এবং বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ রয়েছে ১০৪টি। সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলো হলো–

১) সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা
২) সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রাজশাহী
৩) সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রংপুর
৪) সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, যশোর
৫) সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা
৬) সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ময়মনসিংহ
৭) সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ফেনি
৮) সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কুমিল্লা
৯) সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, চট্টগ্রাম
১০) সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, সিলেট
১১) সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ফরিদপুর
১২) সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, পাবনা
১৩) শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, বরিশাল
১৪) সরকারি মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ময়মনসিংহ

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণ পেশাগত দক্ষতার উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি হন এবং বি.এড ডিগ্রী অর্জন করেন। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকুরি বিজ্ঞাপনে শর্ত থাকে নিয়োগ প্রাপ্তির ০৫(পাঁচ) বছরের মধ্যে বি.এড কোর্স সম্পন্ন করতে হবে।[৭] বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এরকম কোন শর্ত নেই। তবে যেসব শিক্ষক বি.এড প্রশিক্ষণবিহীন তারা বর্তমান ৬৪০০/- টাকা জাতীয় স্কেলে বেতন পান।[৮] বি.এড প্রশিক্ষণ

দেয়ার পর তারা ৮০০০/- টাকা স্কেলে বেতন পান।[৯] তবে কৃষিশিক্ষা, কম্পিউটার শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষকদের বেলায় এই শর্ত প্রযোজ্য নয়। এছাড়াও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, মাধ্যমিক (মাদ্রাসার) শিক্ষক, ননটিচার (যারা এখনও শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত নন; তবে ভবিষ্যতে শিক্ষক হতে চান), তারা বি.এড, পি.জি.ডি.এড (সম্মান বি.এড) কোর্স সম্পন্ন করেন।

বাংলাদেশে শিক্ষার জাতীয় কাঠামো

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা তিনভাগে বিভক্ত।[১০] যথা–

(১) সাধারণ শিক্ষা, (২) কারিগরি শিক্ষা, (৩) মাদ্রাসা শিক্ষা।

সাধারণ শিক্ষা: সাধারণ শিক্ষার বিভিন্ন স্তর রয়েছে।[১১] যথা–

(ক) প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা দুই স্তরের, যেমন– প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা।

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষা। মাধ্যমিক শিক্ষা তিন স্তরের, যেমন- নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা।

(গ) উচ্চশিক্ষা, উচ্চশিক্ষা দুই স্তরের, যেমন- স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর।

মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে (বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান) সহকারি শিক্ষকদের বি.এড ডিগ্রী অর্জন করতে হয়। ফলে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।[১২] বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত চলমান।[১৩]

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য[১৪]

১) শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।

২) ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

৩) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রের সুনাগরিকের গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো।

৪) জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।

৫) দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তাঁর জীবন ঘনিষ্ঠ বিকাশে সহায়তা করা।

৬) দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা, শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।

৭) জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থ-সামাজিক, শ্রেণি বৈষম্য ও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

৮) বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা।

৯) গণতান্ত্রিক চেতনবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।

১০) মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতি স্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

১১) বিশ্বপরিমণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।

১২) জ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর (ডিজিটাল) বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি (আইসিটি) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি) শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।

১৩) শিক্ষাকে ব্যাপকভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর জোর দেয়া, শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষ আত্মকর্মসংস্থান নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

১৪) সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সমমৌলিক চিন্তাচেতনা গড়ে তোলা এবং জাতির জন্য সম-নাগরিক ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সব ধারার শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যবই বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ। একই উদ্দেশ্য মাধ্যমিক স্তরেও একইভাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে পাঠদান।

১৫) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।

১৬) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা।

১৭) শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত (শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ) জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত দৃঢ় করে পরবর্তী স্তরের সাথে সমন্বয় করা। এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থন করা। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা।

১৮) শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।

১৯) সর্বক্ষেত্রে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা এবং মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সাথে দেশের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।

২০) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাচর্চা এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সে লক্ষ্যে যথাযথ আবহ ও পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চিত করা।

২১) শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

২২) পথশিশুসহ আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত সকল ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা।

২৩) দেশের আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্রজাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো।

২৪) সবধরনের প্রতিবন্ধী শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।

২৫) দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

২৬) শিক্ষাক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২৭) বাংলাভাষা শুদ্ধ ও ভালভাবে শিক্ষা দেয়া নিশ্চিত করা।

২৮) শিক্ষার্থীদের শারীরিক মানসিক বিকাশের পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধূলা ও শরীরচর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

২৯) শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩০) মাদক জাতীয় নেশা দ্রব্যের বিপদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সতর্ক ও সচেতন করা।

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য[১৫]

নতুন শিক্ষা কাঠামোয় নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। এই স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা সামর্থ্য অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ধারায় যাবে, নয়তো অর্জিত বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভিত্তিতে বা আরো বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকার্জনের পথে যাবে। মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

- শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা।
- কর্মজগতে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি পর্যায়ের প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা।
- মানসম্পন্ন শিক্ষাদান করে প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক জ্ঞান সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার ভিত শক্ত হবে।
- বিভিন্ন রকমের মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক নৃতাত্ত্বিক ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো। পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর জন্য যতদিন প্রয়োজন বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষার অগ্রগতি সমর্থন করা।
- নির্ধারিত বিষয়ে সকল ধারায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।

শিক্ষার মাধ্যম[১৬]

এই পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হবে মূলত বাংলা তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য-অনুযায়ী নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি ইংরেজি মাধ্যমেও শিক্ষা দেওয়া যাবে। বিদেশীদের জন্য সহজ বাংলা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

টিচার্স ট্রেনিং কলেজে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:[১৭]

- শিক্ষক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের শিখন-শেখানো কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন।
- শিক্ষকদের পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং সময়ের সাথে যুগোপযোগিকরণ সহায়তা দান।
- শিক্ষকদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব, উদ্ভাবনী শক্তিবৃদ্ধি এবং নেতৃত্বের গুণাবলী জাগ্রত করা।
- শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দেশের জরুরী সমস্যাগুলোর সাথে পরিচিত করা এবং তাদের সাথে সম্পৃক্ত করতে সাহায্য করা।
- শিক্ষকদের আচরণিক দক্ষতা ও দূর্বলতা চিহ্নিত করা এবং দূর্বলতার কারণ অনুসন্ধান করে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করা।
- শিক্ষণের জন্য আধুনিক উপকরণ ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন এবং তা ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
- নতুন নতুন শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা ও কৌশল বৃদ্ধি করা।
- গবেষণাপত্র তৈরি ও প্রতিবেদন পেশের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব অর্জনে সহায়তা করা।
- সমাজের সকল ধর্ম, বর্ণ, জাতিসত্ত্বা, আর্থ-সামাজিক শ্রেণির শিক্ষার্থীকে সমান সুযোগসহ পাঠদানে উৎসাহিত করা।

- সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ক্ষুদ্রজাতিসত্ত্বা এবং প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের বিশেষ শিখন সেবা প্রদানের কলাকৌশল অর্জনে সহায়তা করা।
- সমস্যাদি বিশ্লেষণে দক্ষতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা বৃদ্ধি করা।
- তথ্যপ্রযুক্তির শিক্ষায় সকল স্তরের শিক্ষককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করে উন্নত ও আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এর সর্বোচ্চ অনুশীলনে উৎসাহিত করা।
- দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন থেকে কার্য সম্পাদনের জন্য শিক্ষকদেরকে উৎসাহিত করা।
- গবেষণা কাজে অংশগ্রহণের জন্য আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি এবং গবেষণা কাজে উৎসাহিত করা।

শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে প্রায় ১৯৫০০টি এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় (প্রাইভেট) এবং ৩১৮টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে।[১৮] এদের মধ্যে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদায় বেতন পেয়ে থাকেন। বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ বেতন স্কেলের একটা নির্ধারিত অংশ পেয়ে থাকেন সরকারের কাছ থেকে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯৭% বেসরকারি বিদ্যালয়।[১৯] বেসরকারি বিদ্যালয়ের উপরই মূলত মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা পুরোপুরি নির্ভরশীল। তাই শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য দক্ষ প্রশিক্ষিত শিক্ষকের প্রয়োজন।

বাংলাদেশের তিনটি শিক্ষাস্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষা। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো জাতীয় শিক্ষায় এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। দেশাত্ববোধের চেতনায় এবং দেশগঠনে দৃঢ় প্রত্যয়ে অনেক শিক্ষিত যুবক-যুবতী এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকে মহান পেশা হিসেবে বেছে নেন এবং বাংলাদেশের শিক্ষাবিস্তারে ও সমাজ জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মাধ্যমিক শিক্ষকদের জীবনে কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ জানা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের কাজের সাথে তাদের জীবনের চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গতি প্রয়োজন। যদি বিদ্যালয়ের শিক্ষক কাজে আনন্দ না পায় তবে তাদের নিকট হতে সেবামূলক কাজ আশা করা যায় না। এতে মেধাবীরা শিক্ষকতায় আসতে চায় না। তাই তাদের জীবনের চাহিদা ও প্রাপ্যতার সাথে সামঞ্জস্যতা জানা প্রয়োজন। প্রয়োজন তাদের পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব, আকাঙ্ক্ষার কথা জানা। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক অনুসন্ধান ও উন্নত গবেষণার এবং উন্নত প্রশিক্ষণের।

আদর্শ ও দক্ষ শিক্ষক তৈরির জন্য শিল্পকারখানার মত প্রয়োজন আদর্শ শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়। বাংলাদেশের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রয়েছে ১৪টি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ।[২০] শিক্ষক প্রশিক্ষণের মানবৃদ্ধি, প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষার মানউন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রজেক্টের মাধ্যমে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।[২১]

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে চলমান কোর্সসমূহ

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে দুই ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ চালু রয়েছে।[২২] যথা–

(ক) দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স

(খ) স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স।

(ক) দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ হচ্ছে– বি.এড, পি.জি.ডি.এড, বি.এড (অনার্স), এবং এম.এড।

(খ) স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ হচ্ছে– শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে মাধ্যমিক স্তরের কর্মরত শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য স্বল্পমেয়াদে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ:[২৩]

১) মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্র (SESDC)

২) মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (SESD)
৩) মহিলা শিক্ষার্থী উপবৃত্তি প্রকল্প (FASSAP)
৪) মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন প্রকল্প (SESSIP)
৫) Programme to Motivate Training and Employ Female Teachers in Rural Secondary School (PROMOTE)
৬) English Language Teaching Improvement Project (ELTIP)
৭) মাধ্যমিক শিক্ষণমান উন্নয়ন প্রকল্প (TQI-SEP)
৮) স্বল্প ও বিনামূল্যের উপকরণ দিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণে তৈরি প্রকল্প
৯) সেলফোনের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১০) ক্লাস্টার ট্রেনিং প্রকল্প
১১) স্বল্পমূল্যের উপকরণ দিয়ে গণিত শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প
১২) জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা প্রকল্প (LSBE)
১৩) একীভূত শিক্ষা
১৪) WASH প্রোগ্রাম
১৫) বিজ্ঞান মেলা
১৬) CPD প্রশিক্ষণ পরবর্তী পাঠদান মনিটরিং
১৭) STC কোর্স
১৮) ডিজিটাল কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট

উপরিল্লিখিত প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালিত করা হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষকদের গুণগত মান উন্নয়ন ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।[২৪] ফলে টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রজেক্টের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই শিক্ষকদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, শিক্ষকদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটছে এবং বাংলাদেশের শিক্ষানীতি অনুযায়ী তৈরি শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের ব্যাপারে শিক্ষকরা আত্মবিশ্বাস অর্জন করছেন। নিম্নে একটি কেসস্টাডি লক্ষ্য করলে আমরা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবো।

কেসস্টাডি: পাঠ্যবিষয় – পলাশীর যুদ্ধ

এখানে আমরা দেখবো প্রশিক্ষণহীন একজন শিক্ষক কিভাবে ক্লাসে পাঠ্যবিষয় উপস্থাপন করছেন এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক কিভাবে পাঠ্যবিষয় উপস্থাপন করছেন।

১ম শিক্ষক (যিনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন): শ্রেণিতে গিয়ে পলাশীর যুদ্ধ সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে তৎসংশ্লিষ্ট কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন এবং সন্তোষজনক জবাবও পেলেন। ফলপ্রসূ ক্লাস হয়েছে ভেবে তিনি শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করলেন।

২য় শিক্ষক (যিনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত): শ্রেণিতে গিয়ে একটি চার্টের সাহায্যে পলাশীর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তুলে ধরার চেষ্টা চালালেন। মাঝে মাঝে সিরাজ-উদ-দৌলা, লর্ড ক্লাইভের ছবি ও যুদ্ধক্ষেত্রের ম্যাপ দেখিয়ে ধারণায় স্পষ্টতা আনার চেষ্টা করলেন। এরপর শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে পলাশীর যুদ্ধের কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করতে বললেন। তাঁদের জবাব এর উপর ভিত্তি করে একটি তালিকা প্রস্তুত করলেন। পরিশেষে পূর্বপ্রস্তুতকৃত একটি চার্ট যেখানে পলাশী যুদ্ধের কারণগুলো লেখা আছে তা দেখালেন এবং তাঁদের প্রস্তুতকৃত তালিকার সাথে তা মিলিয়ে দেখতে বললেন। শিক্ষার্থীরা দেখলো তাঁদের তালিকার সাথে চার্টের অনেক মিল। তখন শিক্ষার্থীদের মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জানতে চাইলে

শিক্ষার্থীরা যথাযথ উত্তর প্রদান করলেন। শিক্ষার্থীদের মাঝে সৃষ্টির আনন্দ হিল্লোল ছড়িয়ে পড়লো। শিক্ষকও সেই আনন্দধারায় স্নাত হলেন।

সুপ্রিয় পাঠক,

এখন আপনার কাছে প্রশ্ন কোন শিক্ষক বিষয়টি উপস্থাপনে অধিকতর সফল ছিলেন? না, এখনই প্রশ্নটির জবাব অনুসন্ধানের দরকার নেই। তার আগে আমরা কিছু নির্ণায়ক (indicator) এর সাহায্যে তা বিশ্লেষণ করে দেখি।

- কোন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অধিকমাত্রায় সক্রিয় রাখতে পেরেছিলেন?
- কোন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অধিকতর ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার নিশ্চিত করতে পেরেছিলেন?
- কোন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সৃজনাত্মক গুণাবলীর (creative activity) বিকাশ ঘটাতে পেরেছিলেন?
- কোন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি প্রয়োগের তথা মাথা খাটানো (brain storming) এর সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন?
- কোন শ্রেণি অধিকতর মনোযোগী ও সক্রিয় ছিলো?
- কোন ক্ষেত্রে শিখন অধিকতর স্থায়ীত্ব পেলো?
- কোন শিক্ষক শিক্ষার্থীর মাঝে উৎসক্য (curiosity) সৃষ্টি করেছিলেন?
- কোন শিক্ষক শিখনকে দৃঢ় ভিত্তি দিতে পেরেছিলেন?

উত্তরে বলা যায়, হ্যাঁ নিশ্চয়ই দ্বিতীয় শিক্ষক। প্রশ্ন করা যেতে পারে কেন? কারণ তিনি যথাযথ পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে ইন্দ্রিয়সমূহের বিভিন্নমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে সার্থকভাবে শিখন সঞ্চালন করতে পেরেছিলেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শিখন ইন্দ্রিয় সর্বোচ্চ সংখ্যক ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু ইন্দ্রিয় নয় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্ত্বার পুরোটাই পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো গেছে। দ্বিতীয় শিক্ষক এই কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছেন বা করা সম্ভব হয়েছে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য। একথা সত্য যে, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করছে টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলো।

বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সফলতা

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বছরে দুটি সাময়িক ও একটি বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে গ্রেড বা নম্বরের মাধ্যমে ফলাফল প্রদান করা হচ্ছে। অথবা পাশ বা ফেল দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি। যা দেখে বুঝার উপায় নেই, আদতে শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে কোন অংশে ভালো বা খারাপ করেছে। এ পদ্ধতি তাই শিক্ষার্থীদের শিখন সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য প্রদান করে না। ফলে শিক্ষকও এ সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। এতে শিক্ষার্থীরা অনেক কিছু না শিখেই পরবর্তী ক্লাসে চলে যায়। এ ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন গাঠনিক মূল্যায়ন।

গাঠনিক মূল্যায়ন হচ্ছে এমন একটি মূল্যায়ন ব্যবস্থা যার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করা হয় এবং প্রাপ্ত তথ্য শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধানে কার্যক্রম নির্ধারণে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ গাঠনিক মূল্যায়ন হচ্ছে একটি চলমান মূল্যায়ন ব্যবস্থা যার মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি সম্পর্কে ফিডব্যাক প্রদান করা হয় এবং ফিডব্যাকের আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মৌখিক প্রশ্নোত্তর, কুইজ, পর্যবেক্ষণ, অ্যাসাইমেন্ট ও বাড়ির কাজ প্রদান করতে পারেন এবং ফিডব্যাক প্রদান করতে পারেন। এতে শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষেই তার সমস্যা সমাধানের সুযোগ পায়। তার সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে জানতে পারে এবং সে আত্মসক্রিয় হয়। যা তাদের মধ্যে শিখনের আগ্রহ, মনোযোগ ও প্রেষণার সৃষ্টি

করে এবং পরীক্ষাভীতি দূর করে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায় এবং শিখন পরিবেশ হয় বন্ধুত্বপূর্ণ।

আর অন্যদিকে একজন শিক্ষকও তাঁর শিক্ষণ কার্যক্রমের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে জানতে সক্ষম হন পাঠের কোন অংশে তিনি সফল বা ব্যর্থ হয়েছেন, শিক্ষণ পদ্ধতি বা কৌশল নির্বাচন ঠিক হয়েছে কিনা, তিনি সঠিক শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন করতে পেরেছেন কিনা ইত্যাদি। ফলে চূড়ান্ত মূল্যায়ন ব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সবল ও দূর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করতে পারেন বলে শিক্ষণ খুবই কার্যকর হয়।[২৫] এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রজেক্টের মাধ্যমে টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে শিক্ষকদের মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে পাঠদান পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা ধরনের সফলতা আসতে শুরু করেছে। যথা-

- বর্তমানে শিক্ষকগণ পাঠ পরিকল্পনা (lesson plan) তৈরি করে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে যথাসময়ে শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হচ্ছেন।
- শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে গিয়ে পূর্বজ্ঞান যাচাই ও সমন্বয় করছেন।
- শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যবিষয় ভালোভাবে উপস্থাপন করছেন।
- শিক্ষা উপকরণ ও বোর্ডের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে।।
- শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ইউনিফর্ম ব্যবহার করছে।
- শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন থেকে বিরত থাকছেন।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা যথাসময়ে উপস্থিত হচ্ছে।
- শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের নির্দেশাদি মেনে চলছে।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে বন্ধুত্বসূলভ সম্পর্কের সৃষ্টি হচ্ছে।
- শিক্ষার্থীদের গণিত ও ইংরেজি ভীতি দূর হচ্ছে।
- জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মাধ্যমিক শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে সরকারি এবং বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ উভয়ই মানসম্পন্ন হওয়া দরকার। এ প্রসেঙ্গ অধ্যক্ষ মো: আব্দুস সামাদ ম―ল-এর সাথে সম্প্রতি আলাপকালে জানা যায় সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে কিছু সমস্যা দেখা যাচ্ছে। এসব সমস্যার মধ্যে রয়েছে পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ ও আদর্শ শিক্ষকের অভাব, অভীক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থায় ত্রুটি এবং শিক্ষামন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর, ব্যানবেইজ, শিক্ষাভবন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ের অভাব। তাছাড়া ব্যাপকহারে জেনারেল কলেজ হতে বি.এড প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক-শিক্ষিকা টি.টি. কলেজগুলোতে পদায়ন, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের বিপরীতে গণহারে বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অনুমোদন ইত্যাদি সমস্যা বিরাজমান।[২৬]

উপসংহার

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে নানাবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের যোগ্যতা ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে নেতিবাচক মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। শিক্ষার মৌলিক উপাদানসমূহ এবং শিক্ষার ঐতিহাসিক, দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও আইনগত ভিত্তি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের মাধমে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকগণ দিন দিন দক্ষ ও যোগ্য হয়ে উঠছে। যার প্রয়োগে বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা ব্যাপক সাফল্য লাভ করছে। তাই শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ভূমিকা অপরিসীম।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ:

১ বাবুল আনোয়ার, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়াদি, সুদীপ্ত প্রিন্টার্স, নীলক্ষেত, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ২রা নভেম্বর, ১৯৯৬, পৃ. ৯।

২ উদ্ধৃত: ড. শরিফা খাতুন, দর্শন ও শিক্ষা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ অক্টোবর, ১৯৯৯, পৃ. ১২৯।

৩ ড. জাকির হোসেন, শিক্ষামূলক গবেষণা, মেট্রো পাবলিকেশন, ঢাকা, জুলাই, ২০০২, পৃ. ৬৮।

৪ ড. মো. খালেদউজ্জামান, সবার জন্য শিক্ষা: কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল অব আর্টর্স ও ল, ভলিউম ৪০, ২০১২, পৃ. ৬৯-৭৮।

৫ জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, শিক্ষামন্ত্রণালয়, ঢাকা, পৃ. ৫৬।

৬ জাতীয় শিক্ষা জরীপ-২০১২, ব্যানবেইজ, ঢাকা, টেবিল ৬.৫।

৭ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সমকাল, ০৮.০২.২০০৮ ও ১০.০২.২০০৮ইং।

৮ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতনভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠামো নির্দেশিকা, শিক্ষামন্ত্রণালয়, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১০, পৃ. ২৩।

৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪।

১০ হোসনে আরা শাহেদ, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা, সূচীপত্র প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২, পৃ. ৪৪৫।

১১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪৫।

১২ মো: ফজলুল হক, বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, রহিম ল' হাউস, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৪০২-৪০৩।

১৩ ড. ফজলুর রহমান, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, কামরুল বুক হাউস, ঢাকা, ২২তম পুনমুদ্রণ, মার্চ ২০১০, পৃ. ১১।

১৪ জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১-২।

১৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২।

১৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

১৭ *প্রাগুক্ত*।

১৮ জাতীয় শিক্ষা জরীপ, ২০১২, *প্রাগুক্ত*, টেবিল ১.১।

১৯ শিক্ষামূলক গবেষণা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

২০ জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

২১ প্রফেসর মো. হামিদুল হক, শুভেচ্ছা বাণী, বাতায়ন (ম্যাগাজিন), হক প্রকাশনী, রংপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪, পৃ. ১।

২২ বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৯।

২৩ বাতায়ন (ম্যাগাজিন), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭।

২৪ *প্রাগুক্ত*।

২৫ মো: রমজান আলী রুবেল, কার্যকর শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে গাঠনিক মূল্যায়ন (প্রবন্ধ), শিক্ষালাপ, শিক্ষা বিষয়ক ষান্মাষিক, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন, ২০১৪, পৃ. ৭৪-৭৫।

২৬ মো. আব্দুস সামাদ ম―ল, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), সরকারি টিটি কলেজ, রাজশাহী।